ইতিহাসের গল্প।।

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

এই ইতিহাসটার নাম কী হতে পারে – "শব্দ এবং আলোর যৌথ ইতিহাস"? এটা ভাবলেই, এই 'যৌথ' শব্দটা, এবং এই যে আমি একজন আলো, এবং আমিই সেটা লিখছি, এই গোটাটাই একটা তীব্র আভ্যন্তরীণ বিদ্রূপের মত আঘাত করছে আমায়। যৌথ। হ্যাঁ, যৌথ। বিগত বেশ কয়েকটা প্রজন্ম, একটা দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ, যে কোনো জীবিত আলো বা শব্দের সম্ভাব্য স্মৃতির চেয়ে অনেক অনেক দীর্ঘ একটা যুগ ধরে কাহিনীটা শুধু বিদ্বেষের আর পারস্পরিক হিংস্রতার। সেখানে ইতিহাস কেন, আলো বা শব্দের যে কারোর ভূগোলেও অন্য জনের অনুপ্রবেশের বিপরীতে এসেছে শুধু আক্রমণ আর নিধন। আর ভূগোলটা, দুয়েরই, ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল, দ্রুত। আসছি সেই কথায়, আসছি, এই ইতিহাসেই, যদি ইতিহাসটাই রচনা করে চলা যায় আদৌ।

প্রতিটি সঞ্চরমান মুহূর্তেই, এক বার, দুই বার, বারবার তাকাচ্ছি এই অসমান বর্তুলতার দেওয়ালের দিকে। অস্থায়ী আবাস হিসাবে যা নির্মিত হয়েছিল, সৈন্যদের সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখার স্বার্থে, সেটাই ছিল গত বেশ কিছুটা সময় ধরে আমাদের একমাত্র অবশিষ্ট আশ্রয়। এখানেই যারা জন্মেছে এবং বড় হয়েছে, এবং শেষ অব্দি যারা প্রত্যেকেই বিনষ্ট হয়েছে, আমাদের প্রতিটি নগর জনপদ আবাসের মত, তারা কোনোদিন জানতেও পারেনি, এই অসমান বর্তুলতা আসলে আমাদের পুরোনো নির্মাণ প্রকৌশলের একটা নষ্ট হয়ে আসা অবশেষ। আমিও যখন দেখেছি, তখন সেই প্রকৌশল নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই, তবু, তখনো, দেওয়াল আর ছাদের সমতলে, বা দেওয়ালের বর্তুলতায় একটা মসৃণতা ছিল, যা দ্রুত অনুপস্থিত হয়ে গেছে এই শেষ প্রজন্মে এসে। মহাফেজখানা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে অব্দিও, চিত্রধারক মাধ্যমের ত্রিমাত্রিক রূপারোপে দেখা যেত আমাদের পুরোনো অবলুপ্ত নগর জনপদ এবং যে কোনো নির্মাণ, সেগুলো দেখে আমার নিজেরই বিশ্বাস হত না – তার নিকটবর্তী কিছুও আমি দেখিনি কখনো। আবার, আমি আমার কৈশোরে বেশ কিছু মসৃণ নির্মাণ দেখেছি, সর্বসাধারণের শিক্ষায়তন দেখেছি, দেখেছি আরো বহু কিছু, যা ছিল পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রূপকথা। তাদের কাছে এই নির্মাণই বাস্তবতা, যাও লুপ্ত হয়ে চলছিল প্রতিটি ধাবমান মুহূর্তেই। অসমান বর্তুলতার অমসৃণ সেই বন্ধুর দেওয়ালের রঙ বদলে যাওয়াটাই আসে অবলোপ শুরু হওয়ার প্রথম চিহ্ন। তারপরেই দেওয়ালগুলো কুঁকড়ে যেতে শুরু করে, নিচের মাটি কাঁপতে থাকে, শ্বাস নিতে গেলে মনে হয় হাওয়া বরফ হয়ে গেছে, প্রতিটি শ্বাসে রুদ্ধ হয়ে আসে শ্বাসযন্ত্র। আর, সব কিছু স্বপ্রভ হয়ে ওঠে, সব কিছু থেকেই আলো বেরোতে থাকে, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই অব্দি অভিজ্ঞতা আমার নিজেরই হয়েছে দুবার। তারপর ঠিক কী হয় তা কেউই জানেনা, কারণ, সেই জানাটুকু নিয়েই তারাও অনস্তিত্ব হয়ে যায়। কী হয় তারপর, দেওয়াল ছাদ আর মেঝের মধ্যবর্তী ভূমিটা সঙ্কুচিত হয়ে আসে শূন্যের দিকে, নাকি, প্রসারিত প্রশস্ততর হয় অনন্তের দিকে, সেই ভূমির মধ্যবর্তী প্রাণের কী হয়? ভূমির অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের কী ঘটে? আজকে আর জানারও উপায় নেই, গবেষণায় ঠিক কী কী পাওয়া গেছিল। যতটুকু সংবাদ তখন ছড়িয়েছিল সাধারণ্যে, তাতে, ভূমির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের পরিবর্তনের প্রসঙ্গও ছিল কিছু। অনেক খুঁজেছিলাম আমি মহাফেজখানায়, অবলুপ্তির আগে আগে, কিন্তু, যতদূর সম্ভব, শব্দদের হাতে পড়ার ভয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য যত্নসহকারে বিনাশিত হয়েছে আগেই। আজকে আমি জানব, হয়ত, ভূমির তথা বাস্তবতার অবলোপের মুহূর্তে ঠিক কী ঘটে, তার চেয়েও বলা ভালো, জীবন্ত একজন প্রতিনিধির মধ্যে সেই অবলোপ ঠিক কী কী প্রতিক্রিয়া ঘটায়। কিন্তু তারও ভবিতব্য হবে সেই একই, বোধহয়। আমিও জানিয়ে যেতে পারব না। কাউকেই। কেউই আর নেই। এমনকি জানিয়ে যেতে পারব না আর এই ইতিহাসকেও। হয়ত।

এক অর্থে, এটা সত্যিই একটা সার্থক ইতিহাস, সফল পূর্ণাঙ্গ আত্মসচেতন, এবং, তার চেয়েও বড় কথা জীবন্ত ইতিহাস। যে ইতিহাস নিজের শরীর দিয়ে নিজেই নিজেরও ইতিহাস। এই ইতিহাসটা লিখে চলা যাচ্ছে কিনা, তার মধ্যেও লিপিবদ্ধ থাকছে ইতিহাসটা। খুব কম ইতিহাসই যা হয়। শুরু থেকে শেষ অব্দি। লেখক হিসাবে আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মশ্লাঘাও হচ্ছে: আমি লিখছি এই ইতিহাসটা। যদিও, হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই, এর একমাত্র পাঠকও আমিই, বোধহয়। আলো আর শব্দ এই দুয়েরই ইতিহাস অবশেষহীন ভাবে অবলুপ্ত হবে, এই ইতিহাসটা শেষ হতে হতে, এর লেখাটা শেষ হতে হতেই, ঠিক করে বলতে গেলে, এই ইতিহাসটা লেখা শেষ হওয়ার, বোধহয় আগেই। আমি, এর লেখক, এখনও জানিনা, এর শেষটা ঠিক কী হবে, এবং সেটা কখন হবে। ইতিহাস নিজে কি জানবে নিজের শেষটা? আমি কি এর শেষ লিখে যেতে পারব, শেষ অব্দি? ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে আমার নিজের আলোর স্পন্দন – মাঝে মাঝেই টের পাচ্ছি সেটা, একটা খুব ছোট মাপের স্পন্দন, উজ্জ্বলতার একটা দুর্লক্ষ্য দোলা। একটা স্পন্দন পাচ্ছি আলোয়। বুকের আলোর এই স্পন্দনটা আমার স্নায়ুতে কি কোনো ভুল সঙ্কেত পাঠাচ্ছে, প্রতিটিবারই, প্রতিটি স্পন্দন আমার শরীরে পাঠাচ্ছে একটা উল্লাসের বোধ। মৃত্যু কি একটা উল্লাসের শরীরী সঙ্কেত পাঠায়? নাকি, চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্ভাবনা, ভূমি অবলুপ্তির তথা মৃত্যুর রহস্য ভেদের সম্ভাবনা সত্যিই একটা উল্লাস দিচ্ছে আমায়? অথবা, এ কোনো বিভ্রান্তি? মৃত্যু নিকটতর হওয়ার সহগ কোনো বিভ্রান্তি?

স্পন্দনের কথাটা লিখতে লিখতেই মনে হল, এই ইতিহাসটা সত্যিই একটা মহাকাব্যের মুহূর্ত, এর প্রত্যেকটা মুহূর্তই কত কত সহস্রাব্দ ব্যাপী কত অপরিপূরিত জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছে। সেরকম কত কিছু আমি জানতে পারছি প্রতি পলে অণুপলে যা কত কত যুগ ধরে আলো এবং শব্দ কোনো জনগোষ্ঠীর কেউই জানতে পারেনি। শব্দরা শেষ হয়ে গেছে আরো বেশ কিছুটা আগে, তাদের শেষ আশ্রয় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল আমাদেরই আক্রমণে। আর গত কয়েক দিন ধরে আমি একা, প্রশ্নাতীত এবং পরিণামহীন একা। শেষ জীবিত কোনো আলোকে দেখার পরও কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন। এই কয়েকটা দিন ধরে, ক্রমে আরো বেশি বেশি করে আবিষ্কার করেছি সেই প্রশ্নের উত্তর, যা ছিল কত যুগ ব্যাপী আলো আর শব্দদের গবেষণার একটা মূল বিষয়, বুকের এই আলো বা শব্দ কি সত্যিই আবেগের তীব্রতার সঙ্গে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, বেদনা ও বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়? আলো ও শব্দদের ইতিহাসে কেউ কখনো যা জানতে পারেনি, আমি জানলাম। এই নিয়ে কত গবেষণা, কত বিতর্ক। আলোদের এই আলো, বা শব্দদের এই শব্দ, কি প্রকৃত অর্থে শরীরী না মানসিক? আমি এটা জানলাম, কিন্তু, ইতিহাসের আভ্যন্তরীণ বিদ্রূপ এই যে, এই জানাটার আর কোনো মানেই নেই। 'মানে' কথাটার মানে কী? যাকগে, ফিরে আসা যাক ইতিহাসে। সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। আসছে বোধহয়, কোনো কিছুই তো আর নিশ্চিত করে বলা যায় না। শুধু এইটুকু বাদে, যে, যুযুধান দুই জনগোষ্ঠী আলো আর শব্দ দুইই অবলুপ্ত হতে যাচ্ছে। যাচ্ছেই। এমনকি আমি যদি অনির্দিষ্ট কাল ধরে বেঁচেও থাকি, আমার শেষ মানেই এই দুই জনগোষ্ঠীর শেষ। আর প্রজননের গল্প তো নেই আরো অনেকটা আগে থেকেই, যদি সেই সময় আমি চাইতাম-ও, কী ভাবে আর আসত গর্ভাধান? সেই সমস্ত বিভাগগুলোই এখন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আলো আর শব্দ – এদের আমি দুই জনগোষ্ঠী বলছি কেন? আসলে তো একই, দুই জনগোষ্ঠীই তো আসলে এক। জীবকোষের আভ্যন্তরীণ গঠনের বিশিষ্টতার চূড়ান্ত নিরিখেই এক, যা দিয়ে আমরা একটা প্রজাতিকে চিহ্নিত করি।

সেই অর্থে, এই ইতিহাসটারও আর কোনো মানে নেই। কেন লিখছি? ইতিহাস আসে একটা বাস্তবতা থেকে, সেই বাস্তবতাটাই অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে, হয়তো, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়ে যাবে বাস্তবতার এই শেষ অংশটুকুও। আর, যেহেতু, ইতিহাসের একটা নিজের শরীরী প্রত্যক্ষতা থাকে, অক্ষরগুলো রাখা হয় একটা ভৌত আধারে, সেই ভৌত আধারটাও এই বাস্তবতারই অংশ, সেও লুপ্ত হয়ে যাবে একই গতিতে, বাস্তবতার এই শেষ খণ্ডাংশের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। হয়ত। বা, হয়ত নয়। হয়ত, কোনও এক ভাবে, বেঁচে থাকবে? আমি জানিনা, আমার গোটা সভ্যতাটাই জানতে পারেনি, কিন্তু, হয়তো আছে, তেমন কোনও একটা রকম, যে ভাবে বেঁচে থাকে সব বাস্তবতাই, বা, অন্তত তাদের পদচিহ্ন, তাদের লুপ্ত অস্তিত্বের অবশেষ। সেই জন্যেই লিখছি আমি, এই কথা ভেবে? কে জানে? নাকি, এই সভ্যতা, যা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল ক্রমে, যেখানে অস্তিত্বই বেদনা, সেখান থেকে মুক্তি খুঁজছিলাম আমিও, অন্য আরো অনেকেরই মত? আর, তাই, আজ এই পরিণামহীন সমাপ্তির একটা উৎসব রচনা করছি, নিজের সঙ্গে নিজেই? এবং এই চূড়ান্ততম একনায়কতারও, যে, আমিই আমার বাস্তবতার শেষতম উপনিবেশ?

বারংবার মনে হত, শুধু আমার না, আমার মত আরো অনেকের, কী মানে এই যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধের? হ্যাঁ, 'যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ', এই নামই দেওয়া হয়েছিল। আমার নিজের কী উত্তেজিত লাগত, আমার কৈশোরে, যখন ইতিহাসের পাতায় আমি আমার নিজের সপ্তম অধিপিতামহের কথা পড়তাম। শব্দদের বিরুদ্ধে যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধের একদম গোড়ার তিন সেনাপতির তিনি ছিলেন একজন। আজ, এই মুহূর্তেও, আমার নিজের সমস্ত বিবমিষার পরেও, পাঠ্য ইতিহাসে ধূসর দাগে আঁকা আলোদের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম উপস্থিতিদের একজন, সেই দক্ষিণাধিপতির কথা মনে পড়া মাত্র, আমার চোখ বাষ্পময় হয়ে উঠছে। কেন? সত্যিই কি দক্ষিণাধিপতির জন্যে, নাকি, আমার নিজেরই কৈশোরের কোনও বেদনা? কে জানে? দক্ষিণাধিপতি, ওই নামেই তাকে উল্লেখ করা হত সব জায়গায়, তার ব্যক্তিনামে তাকে কেউ উল্লেখ করত না। সমীহ, শ্রদ্ধা, পূজা। দক্ষিণের শব্দরা ছিল সবচেয়ে দুর্ধর্ষ। সবচেয়ে নির্ভীক। তাদের জয় করার মধ্যে দিয়েই ঘোষিত হয়েছিল আলোদের জয়যাত্রার, দক্ষিণাধিপতির নেতৃত্বে। কী হল সেই জয়যাত্রায়? শুধু এটুকুকে নিশ্চিত করা যে, আলো আর শব্দের যৌথ অবলুপ্তির ইতিহাস লেখা হবে একজন আলোর হাত দিয়েই? শুধু এইটুকু? শুধু এর জন্যে ওই প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ?

শুধু একজনকে, একবার মাত্র আমি দক্ষিণাধিপতিকে তার ব্যক্তিনামে উল্লেখ করতে শুনেছিলাম, এবং কী তীব্র ঘৃণা ছিল তাতে। আমাদের আবাসের, সেনাআবাসের, পরবর্তী সময়ে আরোগ্য-ভবনের ভারপ্রাপ্তকে, সে নিজেই তখন আহত, তার সারা শরীরের কোনও কিছু তখন আর সুস্থ নেই, যে রকম হত জীবাণু আক্রমণের পর, জীবাণু নিধন করার ওষুধ যথেষ্টই ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যেত আক্রান্তের শরীরও। এই জীবাণু যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ঠিক আমার আগের প্রজন্মে, এবং নিরন্তরই আরো বিবর্তিত এবং আরো উন্নত হয়ে চলছিল। আলো এবং শব্দ এই উভয়েরই জীবাণু গবেষণার ভয়ঙ্করতা ঠিক এখানেই ছিল, যে, প্রজাতিগত ভাবে তারা দুজনেই এক। তাই উভয় পক্ষের গবেষণাই, শেষ অব্দি, আক্রমণ করছিল একই প্রজাতিকে। আর, যতদূর সম্ভব, নিশ্চিত করে বলা যায়না কারণ এই ঘটনাটা এমন একটা সময়ে এসে যখন অচিরেই গবেষণা বিজ্ঞান তথা শিক্ষা সবকিছুই মুছে যাবে, গবেষণাগারে বদলে নেওয়া জীবাণুরা এক সময় নিজেরাই বদলে যেতে শুরু করেছিল, তাদের বিবর্তিত প্রজাতিগুলো একসময় চূড়ান্ত আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল আলো

এবং শব্দের প্রজাতির উপর। উভয় দিকেরই সেনা আবাসের পর সেনা আবাস বদলে নেওয়া হচ্ছিল আরোগ্য-ভবনে। তার পরে, একসময়, সেই আরোগ্য-ভবনগুলো সামগ্রিক ভাবে সমাধিগৃহ হয়ে যায়। ঠিক সমাধিগৃহ নয়, যেখানে আক্রান্তরা রাখা থাকত, সবসময় তারা মৃতও নয়, মৃত না জীবিত সেই পরীক্ষাগুলোও ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছিল, আর আরোগ্য-ভবনের ওই দিকগুলো সবাই এড়িয়েই চলত। সবাই মানে যে কজন তখনও এড়িয়ে চলার জন্য অবশিষ্ট ছিল। আরোগ্য-ভবন থেকে সমাধিগৃহে এই বদলটা আর কোনো সচেতন বদলের অপেক্ষা রাখেনি, বদলে গেছিল নিজে থেকেই। হয়ে গেছিল। আরোগ্য-ভবনগুলো সমাধিগৃহ হয়ে গেছিল – এটা বলাই ভালো। যাই হোক, কৈশোর অতিক্রমের পর থেকে একমাত্র যে স্মৃতি নিরবচ্ছিন্ন রকমে উঠে আসে আমার মাথার ভিতর থেকে তা ওই সেনা-আবাসেরই, ওইখানেই আমার প্রথম দায়িত্ব পেয়েছিলাম, আরোগ্য-ভবন প্রহরার। আরোগ্য-ভবনের একপাশে ছিল জীবাণু-যুদ্ধের গবেষণাগার। তারই এক দিকে সারিসারি অগণ্য কক্ষ, স্ফটিকের ঘনকাকৃতি কক্ষ, তার প্রতিটিতেই রাখা থাকত এক এক জন করে জীবাণু-আক্রান্ত।

সবাই জানত, সেই কক্ষস্থিতদের পরিণাম কী। কেউ সেটা উচ্চারণ করত না, বাকসংযম ততদিনে জীবনযাত্রার আর এক নাম হয়ে গেছে, গর্ভের শিশুটিও তাতে শিক্ষিত হয়ে যেত, এমনকি তার জন্মের আগেই। যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম জোড়া যুদ্ধ, যুদ্ধ ছাড়া, যুদ্ধকালীন নিয়মনিবদ্ধতা ছাড়া, আর কিছু অবশিষ্ট রাখেনি। কারোর কোনও দাবি নেই, কোনও আকাঙ্খা নেই, কোনও নির্ভরতা নেই। আমাদের সমস্ত নির্ভরতা যেখান থেকে উৎসৃত হয়, সেই মৌলিক নির্ভরতা মানে ভূমি-নির্ভরতাই তখন অনস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে। আসলে যাচ্ছে তার অনেক আগে থেকেই, কিন্তু, প্রায় তিন প্রজন্ম জুড়ে সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল বাস্তবতার অবলোপ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই। কেন গোপন রাখা হত? জাতীয় নিরাপত্তা? শব্দদের সঙ্গে যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ তখন তার তুঙ্গে, যখন, প্রথম একটি উপাসনাগারের একটি দিক সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে যায়, পরে প্রকাশিত মহাফেজখানার গোপন নথি যখন সর্বসমক্ষে আসে, তার থেকে জানা যায়। শুধু এই জাতীয় নিরাপত্তা? আতঙ্ক আটকানো? যোদ্ধাদের তথা জনগোষ্ঠীর মনোবল? গোটা জনগোষ্ঠীই ততদিনে যোদ্ধা। সেই যোদ্ধারা যাতে যুদ্ধের আগেই পরাজিত না-হয়ে যায়? এমনকি, যখন প্রথম প্রথম এই বিষয়ের গোপন জনশ্রুতিগুলো একটু একটু করে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করল, তখন বলার এবং বোধহয় বিশ্বাস করারও চেষ্টা করা হয়েছিল, যে, এই গোটাটাই ঘটাচ্ছে শব্দরা। মহাফেজখানায় এই বিষয়ে 'মিথ্যা গুজব' ছড়ানোর জন্যে প্রথম শাস্তি আর শেষ শাস্তির মধ্যে দূরত্ব ঠিক তিন প্রজন্মের, একই বংশের দুজন মানুষ পেয়েছিলেন সেই প্রথম আর শেষ শাস্তি। দুটো শাস্তিরই অপরাধ এক: শব্দদের হয়ে অকারণ আতঙ্ক ছড়ানোর ষড়যন্ত্রের। আমি নিজে এটা আবিষ্কার করে একটা শ্লেষের মজা পেয়েছিলাম, সবাইকে জানাতে ইচ্ছে করেছিল কাহিনীটা, কিন্তু কাউকেই আর জানাতে পারিনি। কারণ, আমাদের শেষ আশ্রয়ে ততদিনে জনসংখ্যা নেমে এসেছে একশোরও নিচে, এবং, তারা আর কিছুই জানতে চায়না, কোনো কিছুই। জানা মানেই যেন নিজের কাছে আর একবার ঘোষণা করা, একটা মাত্র তথ্যই আর জানার আছে তাদের, নিজের নিধনের সময়। শব্দরা ততদিনে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত। তাই উৎসব, শুধু, মৃত্যুর উৎসব, বিগত বহমান এবং আসন্ন মৃত্যুর উৎসব। মৃত্যু আর মদিরা।

সেই তিন প্রজন্মের কাহিনীটা বলে নেওয়া যাক। প্রথম শাস্তিপ্রাপ্ত হয় যে আধিকারিক, ওই উপাসনাগার ছিল তারই দায়িত্বে, যার সম্পূর্ণ একটা দিক অন্তর্হিত হয়ে গেছিল, ছাদের সুদৃশ্য ধাতব অলঙ্করণ, সারি সারি মূর্তি, এবং উপাসনাগৃহের সম্মুখস্থিত একটা গোটা বাগিচাজোড়া ফুলের গাছসহ। এবং, সবচেয়ে উদ্ভট হল এটাই যে, যেখানে ছিল এই গোটাটা, সেই ভূমিটাই উবে গেছিল পুরোপুরি। ভূমি অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার এই প্রথম ঘটনাটায় একজনও নিহত হয়নি। কারণ, এক সকালে, আলো ফোটার পর, ওই আধিকারিক তার আবাস কক্ষের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন, জানলার ঠিক সামনেই গুল্ম আচ্ছাদিত সেই জোড়া প্রস্তরস্তূপ, যার উপর দিয়ে রাত্রিব্যাপী উপাসনার পর সূর্যোদয় দেখেছেন তিনি বহুবার। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপারটা এই যে, তার জানলার পরই থাকার কথা একটা যাতায়াতের পথ, যে পথ দিয়ে পৌঁছতে হত ওই উপাসনাগৃহে, এবং তার পর ওই উপাসনাগৃহ, তাই ওই জোড়া প্রস্তরস্তূপ এই জানলা থেকে দেখাই যেত না। এর গোটাটাই এখন আর নেই, শুধু তাই নয়, নেই সেই ভূমিটাও যেখানে তাদের থাকার কথা। জানলা দিয়ে শরীর বাইরে বাড়িয়ে সেই আধিকারিক ছুঁয়েছিলেন সেই প্রস্তরস্তূপ, তিনি বিশ্বাস করতে চাইছিলেন যে তিনি এটা সত্যিই দেখছেন।

মহাফেজখানায় লিপিবদ্ধ তার বয়ানেই আমি প্রথম পাই সেই মৃদু অথচ দীর্ঘস্থায়ী বেদনার কথা, যা পরে, সমাপ্তির যত কাছে আসছিলাম আমরা, আমাদের প্রায় সবার একটা অভ্যস্ত চেনা প্রাত্যহিক অনুভূতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও ভূমি অন্তর্হিত হয়েছে কি হয়নি সেটা বোঝার জন্যে আমাদের এটা সদাসর্বদাই ব্যবহার করতে হত। অচেনা ভূমি হলে, রোজকার প্রাত্যহিক ভূমি না-হলে, স্মৃতি থেকে মিলিয়ে নেওয়ার তো কোনো উপায় থাকে না। আর সবসময়ই যে খুব বিরাট একটা পরিমাণ ভূমি অন্তর্হিত হয়ে যাবে, তা তো নয় আদৌ। একজন আলোর বিশ্রাম নিতে যতটা ভূমি লাগে, ততটুকু ভূমিকে আমি অন্তর্হিত হতে দেখেছি, একই দিনে, তিন তিন বারে, দৃষ্টিযোগ্য দূরত্বের ব্যবধানে। ভূমি অন্তর্হিত হয়েছে কি হয়নি সন্দেহ হলে, বোঝার জন্য আমরা আমাদের শরীর বাড়িয়ে দিই, কোনও না কোনও অঙ্গ, সম্ভাব্য অন্তর্হিত ভূমির অবস্থানের উপর দিয়ে। একটু সময় ধরে থাকার পরই, এই হালকা, প্রায় অলক্ষ্য যন্ত্রণাটা শুরু হয় সেই অঙ্গে, ক্রমে সেখান থেকে সারা স্নায়ুতন্ত্রে, শরীরের পরতে পরতে। খুব হালকা একটা যন্ত্রণা, কিন্তু তার যেন কোনও

সমাপ্তি নেই। চলতেই থাকে যন্ত্রণাটা, কখন মিলিয়ে যায় আর বোঝাই যায় না, আর একবার নতুন করে যন্ত্রণাটা পাওয়ার আগে অব্দি।

এই আধিকারিক, স্বাভাবিক ভাবেই, একটা আপাত-উন্মাদ অবস্থায় পতিত হন। এই উপাসনাগৃহ ছিল লোকালয় থেকে দূরে, একটা পাথরের টিলার উপরে, সেটাও জনস্থান থেকে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দূরত্বে। পরবর্তী পূজাপ্রার্থী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার পরই এই গোটাটা আবিষ্কৃত হয়। এবং, প্রচারিত হয় যে, উপাসনাগৃহকে ধ্বংস করেছে শব্দেরা। নিয়ে গিয়েছে আমাদের পুরোনো পুঁথি ও মূর্তি। এবং, ওই পুরোহিত তথা আধিকারিক শব্দদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই সে অকারণ আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এবং, বিচারবিভাগ এর শাস্তি দেয় নির্বাসন। এই 'নির্বাসন' শব্দটা আপাতত নির্দোষ। কিন্তু, বোধহয়, আদতে তা ছিল না। এই বিষয়টায় আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু আমার সন্দেহ এই যে, ভূমি অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, এবং এমনকি তার একটা ছকও, কোথায় এবং কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি করে ভূমি বিলুপ্ত হওয়ার ঘটনাটা ঘটছে বা ঘটবে বা আশু ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, তার সম্ভাব্যতার একটা ছক ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষের কাছে এসে গেছিল। এবং, এই নির্বাসিতদের ছেড়ে আসা হত বোধহয় সেরকম কোনও অঞ্চলেই। হয়ত জীবন্ত গবেষিত বস্তুর আকারে এদের ব্যবহার করা হত। কোনও নির্বাসিত সম্পর্কেই কোনও পরবর্তী তথ্য কোথাও, খুব প্রকট ভাবেই, অনুপস্থিত। এমনকি এদের কারোর শব্দপক্ষে যোগ দেওয়ার তথ্যও, বা এদের মৃত্যু বা নিধন বিষয়েও। ওই আধিকারিক বিষয়েও সমস্ত তথ্যসূত্রও তাই সমাপ্ত হয়ে গেছিল ওই শাস্তির সংবাদেই। হয়ত আমি কিছু পেতাম, যদি ততদিনে বিজ্ঞানাগারের নিজস্ব মহাফেজখানা অন্তর্হিত হয়ে না-যেত, যেমন হয়ত সেখানেই পেতে পারতাম দক্ষিণাধিপতির জীবকোষ পরীক্ষণ বিষয়ক তথ্যও। সেই কথায় পরে আসছি।

এই আধিকারিকের তথ্যসূত্র শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এর জৈবসূত্র শেষ হল না। পূর্বাশ্রমে, মানে, পুরোহিত হওয়ার আগে এই আধিকারিকের সংসারাশ্রমে একটি সন্তান হয়েছিল। সেই সন্তানের সন্তান, সে প্রায় আমারই সমসাময়িক, সামান্য একটু আগের, সে আবার শাস্তিপ্রাপ্ত হয় শব্দদের হয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর ষড়যন্ত্রের অপরাধে। এবং, এই অপরাধে সেটাই শেষ শাস্তি। এর পর পরই, অচিরেই, বিচারবিভাগীয় মূল কর্মকেন্দ্রই অন্তর্হিত হয়ে যায়। আধিকারিকের উপাসনাগৃহ থেকে শুরু করে পরপর বহু বছর ব্যাপী প্রচুর ভূমি অন্তর্ধানের অনিষ্ক্রমণযোগ্য সব তথ্য সংগ্রহ করেছিল সেই আধিকারিকের সন্তানের সন্তান, এবং সেগুলো জনসমক্ষে হাজির করেছিল। এই জায়গাটা আমার নিজের কাছে খুব অব্যাখ্যনীয় লাগে। কী প্রয়োজন ছিল এটা করার? যে প্রমাণগুলো সে পেয়েছিল, মূলত বিজ্ঞানাগারে তার কাজের মারফত, নিজের গোটা জীবনটা বিজ্ঞানাগারে দিয়েছিল শুধু এই উদ্দেশ্যেই যে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে, আর কিছু না। এই সংগৃহীত তথ্য থেকে নিশ্চিত ভাবে সে বুঝতে পেরেছিল, আধিকারিক নয়, মিথ্যা বলেছিল কর্তৃপক্ষ। শুধু এই, শুধু এই সংবাদটুকু প্রকাশের জন্য নিজের গোটা জীবন গোটা মৃত্যু দিয়ে দিল? কেন? শুধু জনসমক্ষে আনবে বলে? কে এই 'জন'? কে? যারা আরোগ্য-ভবনের কক্ষে নিজের জীবাণু আক্রান্ত সন্তানকে শুইয়ে এসেই শব্দদের লুকিয়ে রাখা মদিরার গোপন ভাণ্ডার খুঁজতে যেত? কোনও যুগে যারা বিজ্ঞানভিক্ষু, কারণ, বিজ্ঞানভিক্ষাই তখন প্রথা, কখনও ঘাতক, কারণ, সময় তার হাতে শুধু বল্লম দিয়েছে? সেই জনগত প্রাণ, বা, সঠিক অর্থে, মৃত্যু, ছিল আমাদের লুপ্তমান সভ্যতার বিলুপ্ত বিচারবিভাগের শেষ নির্বাসন। এবং, এর ঘোষণাতেও, সেই একই শব্দবন্ধের পুনরাবৃত্তি: শব্দদের বিধ্বংসী ক্রিয়ার অপব্যাখ্যা, এবং মিথ্যা আতঙ্ক ছড়ানোর ষড়যন্ত্র।

অর্থাত, তখনো সেই একই ঘোষণা। কর্তৃপক্ষ তখনো প্রমাণ করতে চাইছে, যে, ভূমি অন্তর্হিত হয় না। শুধু আক্রমণ আর ধ্বংস, শব্দদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। কিন্তু ততদিনে নিশ্চিত ভাবেই কর্তৃপক্ষের হাতে তথ্য রয়েছে এই বিষয়ের, গবেষণাও চলছে পুরোদমে, বিচারবিভাগীয় এবং প্রশাসনিক মহাফেজখানায় তার পর্যাপ্ত উল্লেখ প্রতি-উল্লেখ আমি পেয়েছি। এই গোটাটাই শুধু আতঙ্ক আটকাতে? আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না। কর্তৃপক্ষ কী? কতকগুলো ব্যক্তি। তাদের প্রত্যেকটা ব্যক্তির ব্যক্তি হর্ষ, ব্যক্তি বিষাদ, ব্যক্তি জয়, ব্যক্তি পরাজয়। আসলে তারা পরাজিত বোধ করছিল এই তথ্যের সামনে, কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছিল না –

উঠে গেছিলাম দেওয়ালের দিকে, অনেকটা দূরে, পরিখা পেরিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে, একটা অদ্ভুত হলুদ রঙের আলো দেখলাম, এরকম বোধ হল। দেখা মাত্র আমার শরীরের মধ্যে একটা ঝনঝন শুরু হল, যেন আমার রক্তসঞ্চালন আমি শুনতে পাচ্ছি। সঙ্গে আলোটাও স্পন্দিত হচ্ছিল। নাকি, সত্যিই আমি কোনো শব্দ শুনলাম। নিজের ভিতর থেকে আসা শব্দ? বুকের ভিতর থেকে? সেটাও তো অসম্ভব নয়। এটাও সেরকম আর একটা তথ্য যা কর্তৃপক্ষ চিরদিন অন্তরালে রাখতে চেয়েছে, অথচ যা গোপন জনশ্রুতিতে চিরদিন বহমান ছিল। অনেক আলোই শব্দ, এবং অনেক শব্দই আলো, এবং অনেক আলোরই শব্দ প্রতিক্রিয়া বা অনেক শব্দেরই আলো প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে, এবং, এটা তারা এমনকি নিজের কাছ থেকেও গোপন করে, এমনকি গোপন করার ক্রিয়াটাও নিজে না-বুঝেই, এই জনশ্রুতি তো আমি নিজেই শুনেছি অনেক বার। আর আরোগ্য-ভবনের ভারপ্রাপ্তের জীবাণু আক্রান্ত শরীর থেকে ছিটকে আসা সেই ঘৃণা আর বাক্য? সেটা কি সত্যিই সত্যি ছিল? দক্ষিণাধিপতি, তাকে সে দক্ষিণাধিপতি বলে ডাকেনি, ডেকেছিল ব্যক্তিনামে, কিন্তু সেই নামটা আমি এখানে

লিখতে পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না। এই প্রসঙ্গটা আসার আগে আমি বারবার ভেবেছিলাম, ভাবছিলাম, আমি এখানে, এই ইতিহাসে অন্তত, প্রথমবার তাকে ব্যক্তিনামে উল্লেখ করব, কিন্তু পারলাম না। আমি কি ভয় পাচ্ছি? বোধহয় না, এখন আর ভয় কিসের? মৃত্যুভয়ও তো চলে গেছে। ভয় ভাঙতে ভয় পাচ্ছি, বোধহয়। সেটা বোধহয় মৃত্যুভয়ের চেয়েও বড়, ভয় ভাঙার ভয়, নিজেকে ভেঙে দেওয়ার ভয়। আমি কী? আমার ভয় ছাড়া? ভয়ের একটা কাঠামো?

অস্পষ্ট গোঙানির ভিতর, আরোগ্য-ভবনের সেই বায়ুরোধী শব্দরোধী কক্ষে, আরোগ্য-ভবনের সেই প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত, যেই জানলেন, আমি দক্ষিণাধিপতির বংশধর, প্রায় ছিটকে উঠলেন ঘৃণায়। যত দূর সম্ভব, টানটান হয়ে উঠেছিল তার অশক্ত শরীর। তারপর যা বলেছিলেন, আমি এখনো নিশ্চিত নই আমি ঠিক শুনেছিলাম কিনা। চূড়ান্ত ঘৃণ্য কিছু কথা বলেছিলেন দক্ষিণাধিপতির বিষয়ে, আমাকেও, যেহেতু আমিও তারই বংশধর। বলেছিলেন, দূষিত আমার বংশানুক্রম, কারণ, দক্ষিণাধিপতি নিজেই ছিলেন শব্দ। সেটা পাছে লোকে জেনে যায়, তাই যুদ্ধটা তাকে শুরু করতেই হয়েছিল। তার একাধিক সন্তানও তাই, তারা আলো নয়, শব্দ। তাদের নাকি নিজেই হত্যা করেছিল সেই সন্তানঘাতক। কিন্তু শত কিছুর পরও গোপন করতে পারেনি, কারণ, তার মৃত্যুর পরে, তার জীবকোষ পরীক্ষণের বিবৃতিতে স্পষ্টই সেটা ধরা পড়েছিল। তারপর অদ্ভুত একটা ঘৃণায় শূন্য দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত। তারপর, কক্ষাভ্যন্তরে স্ফটিকের ভাস্বর ছাদের স্থির শান্ত শীতল আলোর থেকে দৃষ্টি নিজের দিকে সরিয়ে আনতে আনতে বলেছিলেন, আর কিছু না, কিছু না, যাও নিজেকে হত্যা করো।

আমি জানিনা, কতবার নিজের মাথায় বাক্যটাকে নাড়াচাড়া করেছি, এখনো জানিনা, বাক্যটা ঠিক কাকে বলেছিলেন তিনি? আমাকে? নাকি নিজেকে? অথবা, বলেছিলেন, যে এটাই আসলে আমরা করছি? নাকি, এটাই আমাদের ভবিতব্য? জীবাণু সংক্রমণের কারণে ঠিক কতটা মাত্রায় প্রলাপ হতে পারে, আমি জানিনা, যে আরোগ্য-ভবনের দায়িত্ব আমি পেয়েছিলাম, তা তো সঠিক অর্থে ততদিনে সমাধিগৃহ, কিন্তু এটা প্রলাপ বলে আমার বিশ্বাস হয় না। কেন? কেন বিশ্বাস হয় না? এমন নয় তো, যে, এটাকেই আমি বিশ্বাস করতে চাই? কেন চাই? তাতে সবচেয়ে বেশি করে নিজের প্রতি বিষোদ্গার করা যায় বলে? নিজেকে আঘাত আক্রমণ জর্জরিত করার মত সুখ আর কিসে? শুধু, সেই সহজতম সুখটাকে চেনাটা সহজ নয় একটুও, সেই ক্রিয়াটাকে চিনতে চিনতেই চলে যায় জন্ম মৃত্যু এবং আরো কত কিছু, কত যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ। কাকে হত্যা করি? নিজেকে ছাড়া? প্রতিটি হত্যাই আত্মহত্যা। যে আত্ম নয় তাকে হত্যা করতে জানিনা আমরা। হত্যা করার জন্যে তাকে আত্মস্থ করতে হয়, জানতে হয়। এই জীবাণুদের আমরা হত্যা করতে পারিনা, এদের আমরা জানিনা বলে। আর এরা আমাদের হত্যা করে না, এরা শুধু উপনিবেশ বানায়, বাস্তবতা বানায়, বানাতে বানাতে গোটা প্রক্রিয়াটাই কখন বদলে যায়, আধারের দেহটা, সেখানে প্রাণের উপস্থিতি, মানে জীবাণুদের প্রাণ নয়, দেহের পুরোনো প্রাণ, গোটা অবস্থাটাই বদলে যায়, জীবাণুরা নিজেরা জানতেও পারে না।

এখন, নিজের বুকের আলোয় এই ইতিহাস আমি লিখে চলেছি। লিখতে লিখতে কত কিছু ছিটকে আসছে নিজের ভিতর থেকে। কত কত অজানা সঙ্কেত, কত অজানা উচ্ছ্বাস। নিজের বুকের আলো, আলো নাকি শব্দ? আমি নিজে আলো না শব্দ? কাকে, কাদের আমি হত্যা করেছি আমার গোটা জীবন জুড়ে, প্রজন্ম জুড়ে, প্রজন্মের পর প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে, কে তারা, তারা কি শব্দ, নাকি আসলে তারা শব্দ বলে প্রচারিত আলো? যেমন, হয়ত, দক্ষিণাধিপতি থেকে শুরু করে, আমার এই বংশানুক্রম আসলে আলো বলে প্রচারিত শব্দের? এর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর আমি জানিনা। এবং, আর জানতেও পারব না। 'জানা' মানে কী? সেই জানা বা না-জানা নিরপেক্ষ ভাবেই আমার ভিতর থেকে উঠে আসে গতি, উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস, আমি আলোড়িত হই। সেই আলোড়নই ধাক্কা তৈরি করে আমার শরীরে? নাকি, আসলে এই বাস্তবতাও আক্রান্ত হতে শুরু করেছে অজানা সেই অবলোপে? অবলোপের চিহ্নগুলোকে আমি নিজের শরীরের চিহ্ন বলে ভাবছি? সব কিছু আমার কেমন জটিল প্রহেলিকাময় লাগে। হয়ত, এই প্রহেলিকাময় লাগাটাও এই অবলোপের প্রক্রিয়ারই একটা স্তর। হয়ত, হয়ত নয়। কেউই জানেনা, আর কেউ জানবেও না। দেওয়ালটায় কী কোনো বদল পাচ্ছি?

মহাফেজখানায় এই অবলোপের প্রক্রিয়ার প্রচুর উল্লেখ পেয়েছি। কোথাও কোথাও এই বিষয়ে গবেষণার প্রসঙ্গেও। তার প্রায় কিছুই বুঝতে পারিনি। তবু, ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করেছি, চেষ্টা তো করতেই হয়। গবেষকরা কি পদার্থের অজ্ঞাত অভ্যন্তরে ভূমি এবং কালের কোনো একটা জটিলতা কোনো একটা মোচড় খুঁজে পাচ্ছিলেন, যে মোচড়টা একই সাথে একাধিক কালকে উপস্থিত করতে পারে? ভূমি ও কালের একাধিক সমবায়কে? আসলে উপাসনাগার আধিকারিকের ওই ঘর পথ মন্দির আসলে, অন্য যে কোনও কিছুর মতই, অন্য যে কোনও ভৌত উপস্থিতির মতই, শুধু ভূমি নয়, শুধু কাল নয়, আদতে ভূমি এবং কালের একটা সমবায়। যে সমবায়টা এবার বদলে গেছিল? আধিকারিকের বিশিষ্ট কাল এবং ভূমির সমবায়টা? মধ্যের ওই অনুপস্থিতি আসলে চিহ্নিত করছে অন্য কোনও ভূমি-কাল সমবায়ে তাদের উপস্থিতিকে?

কিন্তু, কী করে বদলাল সমবায়টা? বিজ্ঞানাগারের মহাফেজখানা তো বিলুপ্ত হয়ে গেছিল আগেই। যদিও, যদি এমনকি আমি সেটা খুঁজেও পেতাম, কত দূর সেটা অধিগম্য হত আমার, জানিনা তা। অনেক প্রজন্ম আগে, যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধের আগে, এমনকি যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ শুরু হবার পরেও, কয়েক প্রজন্ম অব্দি বিজ্ঞান কলা সাহিত্য এরকম সব কিছুর একটা

সর্বমোট শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু আমার কৈশোর যৌবনে এসব আর পাইনি আমরা, তার অনেক আগেই এসব উঠে যেতে শুরু করেছে। তখনো শিক্ষা বলে একটা ব্যাপার টিকে ছিল, যার বেশির ভাগ অংশটাই ইতিহাস, আলো গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপ্রেমিক ইতিহাস, যুদ্ধের ইতিহাস, এবং মূলত যুদ্ধবিদ্যা, কিছুটা কৃষি, এবং তার কারণে কিছু কিছু বিজ্ঞানের নিয়ম। তারপর এক সময় তাও উঠে গেছিল, শেষ অব্দি যুদ্ধটা তো আর সঠিক অর্থে শব্দদের বিরুদ্ধেও রইল না। হয়ে দাঁড়াল বাস্তবতা অবলোপের বিরুদ্ধে, জীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই। আসলে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ। যুদ্ধ মানে আর কী? শুধুই পালাতে থাকা, পিছনে শব ফেলে পালাতে থাকা, এবং সেই শবগুলোও আর থাকছিল না, বাস্তবতা লোপের গতিটা এত দ্রুত বেড়ে গেছিল শেষ দিকে, গোটা ভূমিটা বাস্তবতাটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল, বাস্তবতার এক একটা ছিন্ন শিরা বা উপশিরা ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিলাম আমরা, শুধুই অস্থায়ী আবাস আর সমাধিগৃহ বানাতে থাকা, এবং তাদের অবলোপের অপেক্ষা করা। আর তার মধ্যে মধ্যে নিয়তই সংক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামিতদের অবশিষ্টদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। শেষ দিকে, এই অবলোপ একটা উল্লাসও তৈরি করেছে কখনো কখনো, গোটা গোটা সমাধিগৃহ অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার একটা অনুচ্চারিত অঘোষিত অপ্রকাশ্য উল্লাস। একদম শেষে আর সেটা অপ্রকাশ্যও থাকত না। এক জন কমা মানে তো সরবরাহের ভগ্নাংশ যতটুকু হোক বাড়া।

নিজের যৌবনের শেষ দিকে, যখন প্রথম বুঝতে শুরু করেছিলাম, কর্তৃপক্ষ কী ভাবে গোপন করে অবরুদ্ধ করে তথ্যকে, খুব ক্রোধ হয়েছিল, তীব্র একটা ক্রোধ। এখন মনে হয়, জানলেই বা কী হত? যেটা হল, আর যেটা হত, যেটা হতে পারত, এই দুটো তো কখনো একই সঙ্গে হতে পারে না, তাই এদের তুলনাও করা যায় না। যা ঘটে, সেটা না-ঘটলে, আর একটা কিছু ঘটে। তাহলে? কেন ক্ষোভ? কেন ক্রোধ? কিন্তু, একটা জায়গা সত্যি, কর্তৃপক্ষ সত্যি কথা বলেনি। যে কথাটা লিখতে লিখতে দেওয়াল দেখতে উঠে গেলাম, কর্তৃপক্ষ মানে কিছু ব্যক্তি। কিছু ব্যক্তির সমাহার। তারা বাস্তবতার সামনে দাঁড়াতে ভয় পেয়েছিল, বাস্তবতা অবলোপের বাস্তবতার সামনে। শব্দদের সঙ্গে যুদ্ধ তাদের চেনা ভুবন। তাকে তারা চেনে। এই অবলোপকে তারা চেনে না। তাই ভয় পেয়েছিল সেই কয়েকজন ব্যক্তি। প্রতিটি শাস্তির ঘোষণায় তাই তারা বারবার একই মিথ্যাচার করে চলছিল। হিংস্রতা যেমন চূড়ান্ত অর্থে নিজের সঙ্গে হিংস্রতা, মিথ্যাও তাই, প্রতিটি মিথ্যাই নিজের সঙ্গে মিথ্যা। কেন মিথ্যা বলছি, এই ব্যাখ্যার একটা রূপকথা নিজের কাছে বানিয়ে তোলার মিথ্যাচরণ। এখন, এই ইতিহাস লিখতে লিখতে, এই কথাটা মাথায় আসা মাত্র, দক্ষিণাধিপতির প্রতি আমার বিরূপতাটাও কোথাও একটু কমে গেল। যে কেউই শুধু তাই-ই করে, যা করতে সে বাধ্য হয়। শুধু যতটা বড় বলে সে প্রচারিত ততটা বড় করে ততটা আড়ম্বরপূর্ণ মিথ্যা সে বানাতে বাধ্য হয়। হয়ত, শেষ অব্দি, দক্ষিণাধিপতি শব্দদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল, কারণ, আর কিছু তার করার ছিল না। নিজের কাছে পরবর্তী মিথ্যাগুলোকে তার বানিয়ে তুলতে হয়েছে, কারণ সে ততদিনে দক্ষিণাধিপতি হয়ে গেছে, তাই, সেই অর্থেও, আর কিছু তার করার ছিল না। একটা আরাম হল আমার, এটা ভেবেই, কারণ খোঁজার অকারণ অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে।

শুধু এই জায়গাটুকু সত্যি যে, কর্তৃপক্ষ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কী করে ঘটছে অবলোপটা। কী করে বদলে যাচ্ছে ভূমি ও কালের সমবায়টা। কেউ কি সচেতন ভাবে বদলাচ্ছে সমবায়গুলো? কে? কেন বদলাচ্ছে? এই সংক্রান্ত গবেষণার যে উল্লেখ খুঁজে পেয়েছিলাম, তাতে এই বিষয়ে একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা ছিল। তার মোদ্দা কথা এই যে, সচেতন ক্রিয়া মানে একটা সচেতন ছকের উপস্থিতি। মানে, বাস্তবতার চালু ছকের শরীরে কিছু পরিকল্পিত আরোপিত বদলের একটা দ্বিতীয় ছক। আর যখন এমন কোনো দ্বিতীয় ছক থাকে না, বাস্তবতা বেড়ে ওঠে ওই প্রথম ছকেই। নিয়ন্ত্রিত এলোমেলোপনার একটা ছক। যা ঘটছে সব স্বতস্ফূর্ত, সব তাৎক্ষণিক, কিন্তু তাদের ইতিহাস এবং ভূগোলকে মিলিয়ে একটা ছক রয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতার মূল অপরিবর্তিত প্রথম ছক। হাওয়া বয় এলোমেলো, পাথরে বাড়ি খায় এলোমেলো, কিন্তু মোট ভুবনের মোট পাথরের শরীরে মোট হাওয়ার পদচিহ্ন ঘটার একটা সামগ্রিক ছক পাওয়া যাবে। এবার, যদি কোনো সচেতন বদল সেখানে যোগ হয়, নিয়ন্ত্রিত এলোমেলোপনার এই প্রাথমিক ছক এতে ভেঙে যাবে। এবং সেই বদল কোনোদিনই প্রাকৃতিক সামগ্রিক স্বতস্ফূর্ততার প্রাথমিক ছকের মত সর্বব্যাপী, সর্বব্যাপী এলোমেলো এবং সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে না। সেখান থেকেই সচেতন ক্রিয়ার সীমাবদ্ধতাটা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। ওই গণিতবিদ এই যুক্তিতে, বাস্তবতার প্রতিটি অবলোপের মানচিত্র এবং সময়পথকে মিলিয়ে দেখিয়েছিলেন, সেরকম কোনো দ্বিতীয় ছক এখানে নেই। তাই সচেতনে কেউ অবলোপ ঘটাচ্ছে না আমাদের ভূমি ও বাস্তবতার।

তাহলে? কেন? ওই গণিতবিদ যে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা রেখেছিলেন, তার বিষয়ে একটি নথীতে উল্লিখিত ছিল কল্পকথা বলে। গণিতবিদ বলেছিলেন, এর একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটা জীবনপ্রক্রিয়া চলছে, সেই প্রাণী বা সেই প্রাণ এমন কোনো একটা বাস্তবতায় বিরাজ করে, গঠনগত ভাবেই যাদের ভূমি ও কালের সমাহারটা ভিন্ন। তারা স্বতস্ফূর্ত ভাবেই চালিয়ে চলেছে তাদের জীবনপ্রক্রিয়া। কিন্তু তাদের সেই ঘটমানতা কোনও এক অজানা রকমে ভূমি কালের সমাহারগুলোকে বদলে দিচ্ছে। গণিতবিদের কথা অনুযায়ী, এমন হতেই পারে যে সমাহার বদলে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটা তাদের কাছেও অজানা। এবং, তারা সচেতন প্রাণী না অসচেতন প্রাণী সেই বিষয়েও নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না। গণিতবিদের মত অনুযায়ী, এই রকম হলে, কোনও দ্বিতীয় ছকের অনুপস্থিতিকে ব্যাখ্যা করা যায়। কারণ,

এটাও একটা স্বতস্ফূর্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হওয়ায়, যে কোনও প্রাকৃতিক ছকের সঙ্গে সেই নিয়ন্ত্রিত এলোমেলোপনার প্রথম ছককে নিজের মত করে বদলে দিয়ে মিশে যাবে এই পরের ছকটাও, প্রকৃতির মধ্যে যেমন মিশে থাকে অনন্ত প্রক্রিয়া। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত এলোমেলোপনাটা এতে ভেঙে যাবে না।

স্বাভাবিক ভাবেই গণিতবিদের এই মতামত ভালো লাগেনি কর্তৃপক্ষের। তারা তখন ভয়ানক রকমে একটা ধারণযোগ্য অপরাধী খুঁজছে। হয়ত এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, শব্দরা যে এতে জড়িত, এটা প্রমাণ করা। কিন্তু গণিতবিদের যুক্তি মানলে শব্দেরা কোনও ভাবেই এতে জড়িত থাকতে পারে না। সেটা হবে সচেতন বদল। তাই, নিয়ন্ত্রিত এলোমেলোপনার প্রথম ছকটাকে সেটা ভেঙে দেবে। বানিয়ে তোলা একটা ঝড় যেমন কখনোই একটা বাস্তব ঝড়কে সর্বাঙ্গীন রকমে হাজির করতে পারে না, পারে বিশ্বাসযোগ্যতার একটা নির্দিষ্ট কাঙ্খিত মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। এলোমেলোপনার গণিতের কাছে তাকে হার মানতেই হবে।

ইতিহাস লেখার আধারটাকে আমার আরো কাছে নিয়ে এলাম। বুকের আলো কি কমে যাচ্ছে, নাকি, দৃষ্টির সমস্যা হচ্ছে? অন্য আলোর জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে আগেই, একটানা এতক্ষণ শুধু এই আলোয়, আমার দৃষ্টিতেই কোনও সমস্যা? অথবা, আমার জীবনীশক্তি? এটা আমার আগে মাথায় এল না কেন? এটা ভাবতে কি আমার খারাপ লাগছে? আমার কি মৃত্যুভয় হচ্ছে?

গণিতবিদের এই মতামতের কথা জানার পর থেকেই আমার মনে হয়, এমন যদি হয়, সত্যিই এরকম কোনও একটা জীবনপ্রক্রিয়ার জন্যেই এটা ঘটছে, তারা কি সচেতন প্রাণী? 'সচেতনতা' মানে কী? তারা কি জানে, এরকম ঘটছে? তাদের জীবনপ্রক্রিয়া যদি আমাদের বাস্তবতাকে এই ভাবে বদলে দিতে পারে, আমাদের জীবনপ্রক্রিয়াও কি একই ভাবে বদলে দিচ্ছে ওদের বাস্তবতাকেও? এরকম মনে আসায়, ওদের প্রতি একটা মায়া হয় আমার। আমাদের ভবিতব্য এখন নিশ্চিত, যে, আমাদের আর কোনও ভবিতব্য নেই। কিন্তু ওদের? যদি ওরকম কেউ থাকে? এই মুহূর্তে, এটা লিখতে লিখতে আমার মনে হচ্ছে, কী আরাম। নিশ্চয়তা বোধহয় আরামের নাম। এখন যদি আমার আশু নিধন নিশ্চিত না-হত, নিশ্চিত না-হত আমার সন্তান হওয়ার অসম্ভাব্যতা, গোপনে কোথাও আমার অনুভূতির মধ্যে ক্রিয়াশীল দক্ষিণাধপতির প্রসঙ্গটা তখন গর্ভাধান বিষয়ে আমায় বিরূপ সিদ্ধান্তে না পৌঁছে দিত, কত কিছুই এখন আলোড়িত তাই আতঙ্কিত রাখত আমায়। আমি এখন চিন্তামুক্ত, কারণ, আমার কোনও ভবিতব্য নেই আর। কিন্তু, ওই সম্ভাব্য ওদের কী অবস্থা? ওদের প্রতি একই সঙ্গে মায়া হয় আমার, একটা দুশ্চিন্তাও, আমার শত্রুর জন্যে। শব্দদের সঙ্গে যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে আগেই, ওই ওদের প্রতি বিরূপতার ভার থেকেও এখন মুক্ত আমি, বাস্তবতা লোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে আমায় মুক্তি দেওয়ায় ওই গণিতবিদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

একটা অপরাধবোধ এবং অনুতাপ, এবং একইসঙ্গে এই দুটোরই অর্থহীনতা, আমার মাথায় তাদের ছায়া ফেলছে। যদি এমনও হয়, ওই ওদের যাবতীয় ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়া, বাসনা ও পরিপূরণ, সমস্ত কিছুই বিনষ্ট করেছি এবং করছি আমরাই, এর কোনওটাই তো জেনে করা নয়। যার সঙ্গে যুদ্ধ করছি তাকে বেদনা দেওয়ার মুহূর্তে, বিরূপ তো তার প্রতি হতেই হয়, বিদ্বেষের সেই বাতাবরণের মধ্যেই আমাদের জন্ম ও মৃত্যু। শব্দদের প্রতি সেই বিদ্বেষের ভার থেকে মুক্তি পেয়েছি একদম জৈব উপায়েই, চরমতম পতন হয়েই গেছে শব্দদের। আর, ওই অজানা ওদের প্রতি বিদ্বেষের জায়গাটা বিচলিত এবং চঞ্চল হয়ে গেছিল আমার, গণিতবিদের তত্ত্ব জানার পর থেকে। কী করছি, তার কী ফলশ্রুতি না-জেনেই, আমরা এবং ওই ওরা পরস্পরকে যদি তাড়িত করে থাকি, তাহলে বিদ্বেষের গোটা তলটাই ভারি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই, এত যুগ, এত প্রজন্মের পর, শেষ অব্দি বিদ্বেষের ভার থেকে মুক্তি এল। কিন্তু, এই মুক্তি এল একা আমার। ইতিহাস হয়ত এই ভাবেই বেছে নিচ্ছিল, কার মাধ্যমে সে নিজেকে লিপিবদ্ধ করবে। অন্যদের কাছে পৌঁছনোর আর কোনও মানে ছিল না, আমি এটা বুঝলাম, উপাসনাগার আধিকারিকের সন্তানের সন্তান যা বোঝেনি।

বরং একটা কাহিনী শোনার কৌতূহল দিয়েছিল আমায়, গণিতবিদের এই কল্পকাহিনী-উপম প্রকল্প। ওই ওদের ক্ষেত্রে ঘটনাগুলো ঠিক কী ঘটছে? গণিতবিদের তত্ত্ব এবং পদার্থবিদদের গবেষণার খণ্ড-উল্লেখ, এই দুটো মিলিয়ে আমার মধ্যে একটা চূড়ান্ত নিয়োগ আসে - পরিপূর্ণ উদ্দেশ্যরিক্ততা ছাড়া যে নিয়োগ সম্ভব নয়। ইতিহাস আমায় একটু একটু করে প্রস্তুত করে নিচ্ছিল, সমস্ত উদ্দেশ্য সমস্ত বিধেয় থেকে নগ্ন উলঙ্গ স্পষ্ট করে তুলে। এখন আমার ইতিহাসই আমাদের সভ্যতার ইতিহাস। আমার ইতিহাসের মৃত্যুই ইতিহাসের পরিপূর্ণতা, তাই পরিপূর্ণ মৃত্যু। সেই মৃত্যুর মাদকতা কই, যেখানে মৃত্যুও অবিমিশ্র মৃত্যু নয়। যা ঘটেছে তা না-ঘটলে কী ঘটতে পারত, জানিনা তা, কিন্তু যা ঘটেছে তার পুরোটার জন্যেই খুব পরিতৃপ্ত এবং কৃতজ্ঞ লাগে আমার। এখন নিয়োজিত থাকি আমি কল্পনার অদিগন্ত উন্মুক্ততায়, কোনও দিগন্ত দিয়ে যা সীমাবদ্ধ নয়। ভূমি ও কালের সমবায়ের বিশিষ্টতা দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড চিহ্নিত হয়। সেই সমবায়ের ভিন্নতা মানে অনেক ব্রহ্মাণ্ড। এক ব্রহ্মাণ্ডই অনেক ব্রহ্মাণ্ড। ভূমি কাল সমবায়ের এক একটা মোচড় বদলে দিচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডকে। নিয়ে যাচ্ছে এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে। একই সঙ্গে তারা প্রতিটিই বাস্তবতা, এবং, আলাদা আলাদা বাস্তবতা। এক ব্রহ্মাণ্ড মানেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সম্ভাবনা। কারণ, ভূমি ও কালের সমবায়ের প্রতিটি মুহূর্ত চিহ্নিত করছে এক একটা আলাদা ব্রহ্মাণ্ডকে।

আমার তরুণ বয়সে যতটুকু পাঠ নিতে হত আমাদের, তাতেই আমরা জেনেছিলাম, ভূমির তিনটে মাত্রা অব্দি সচেতনতায় আনা যায়, তার চেয়ে বেশি মাত্রা চিন্তায় আনা যায় না, তাকে বুঝতে হয় গণিত দিয়ে। এটুকু জানিয়েই থেমে গেছিলেন আমাদের শিক্ষক, যে, তাই বলে তারা নেই তা নয়। এটা ভেবে একটা মৃদু আক্ষেপ হয় আমার, যে, আর একটু যদি জানতাম, তাহলে হয়ত ভেবে নিতে পারতাম দৈর্ঘ প্রস্থ বেধ এই তিন মাত্রা, এবং সময়ের এক, এই চারটে মাত্রার বাইরে। ভেবে নিতে পারতাম ওই ওদের। কিন্তু, পারতাম কি সত্যিই? মহাফেজখানায় বিজ্ঞানবিদদের গবেষণার উল্লেখ যা যা পেয়েছি, তাতে, সেরকম তো মনে হয়নি কখনো? তাদেরও আমার একই রকম অসহায় বলে মনে হয়েছে। শুধু তাদের শিক্ষিত অসহায়তা আর একটু ত্রুটিহীন রকমে নিজের অসহায়তাকেই চেনার সুযোগ দিয়েছিল। অসহায়তার অপনোদন করেনি। অপনোদন করানোর কি কোনও চেষ্টাও করেছিল এরা - এই বিজ্ঞানবিদরা? লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আগে অব্দি মহাফেজখানার যে কোনও আধারে তেমন উল্লেখের কোনও অভাব ছিল না, কী ভাবে, বিজ্ঞাননির্ভর কত কিছু বলা হচ্ছে, বিজ্ঞান দিয়ে, বিজ্ঞান ব্যবহার করে, যার মূল উপজীব্য একটাই, শব্দদের হত্যা। যদি আরোগ্য-ভবনের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্তের বক্তব্য সত্যি হয়, দক্ষিণাধিপতির নয় নিজেকে প্রমাণ করে চলতে হয়েছে, তাই যুদ্ধযাত্রায় তাকে যেতেই হয়েছে, কিন্তু এই বিজ্ঞান, এদের তো এমন কোনো দায় ছিল না। তাহলে?

এবং, কী সে যুদ্ধ? কার সঙ্গে? যুগের পর যুগ ধরে সেই যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ? নিজের অভ্যন্তরে সেই তীব্র ঘৃণাটা মনে পড়ে আমার, গর্ভাধান প্রত্যাখ্যান করার সেই সময়টায়। প্রাক্তন ভারপ্রাপ্তের প্রতি তাই একটা কৃতজ্ঞতা থাকে আমার, দক্ষিণাধিপতির প্রতি ঘৃণা করে চলার সেই ভার থেকে আমায় মুক্ত করার। সত্যিই, এতটা ঘৃণা আমি করতাম কেন দক্ষিণাধিপতিকে? এতটা ঘৃণা করার মত গুরুত্বপূর্ণ কি কেউ হতে পারে? শেষ অব্দি সবাই তো ব্যক্তি। কিছু ব্যক্তি বিষাদ, ব্যক্তি উল্লাস, এবং, তার চেয়েও বড় কথা, ব্যক্তি অসহায়তা। কিন্তু এই গোটাটাই বুঝেছিলাম অনেক পরে এসে। তখন আমার দিনশুরু দিনশেষ সবই খচিত হয়ে যেত দক্ষিণাধিপতির প্রতি বিরূপতা দিয়ে। কেন? কেন সেই যুদ্ধ, যা আক্রমণ করে নিজেদেরই? গোষ্ঠীপ্রেম দিয়েই সবকিছু নির্ধারিত হয়ে চলছিল যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুড়ে, আলো গোষ্ঠীতে, এবং, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, সেই একই ভাবে শব্দ গোষ্ঠীতেও। কিন্তু, কী সেই যুদ্ধ? কেন? গোষ্ঠীপ্রেমিক আলো-ইতিহাসের পাঠে খুব সযত্নে এড়িয়ে চলার চেষ্টা হত প্রসঙ্গগুলো। কিন্তু, শেষ অব্দি, কী ছিল সেই যুদ্ধের ভিত্তি? আলো না শব্দ, কে মহত্তর? আলো-পাঠ্য ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকত, যাদের শরীর থেকে আলো বেরোয়, তারাই এই জগতের মহত্তম, কারণ, সব ইন্দ্রিয় সংবেদনের মধ্যে দৃষ্টি তাই আলোই চূড়ান্ত। নিশ্চয়ই এর বিপরীতটা আবার লিপিবদ্ধ থাকত শব্দ-ইতিহাসে। কী হাস্যকর। কি ঘৃণ্য লাগত গোটাটা। মহাফেজখানায় অনেক পুরোনো, অনেক অনেক পুরোনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের উল্লেখও পেয়েছিলাম আমি, যা পড়তে নিজেরই বিরক্তি লেগেছিল আমার।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অনেক প্রাচীন উপাখ্যান এসব। অনেক অনেক আগের। যুগান্তরব্যাপী যুদ্ধ শুরুরও আগের। তখনও আলো এবং শব্দ একই গোষ্ঠী। একই সঙ্গে থাকত তারা। এটা লিখতে গিয়ে খুব আমোদ পেলাম, তার মানে, তখন গোষ্ঠীপ্রেম বলতে বোঝাত, আলো এবং শব্দের মিলিত গোষ্ঠীর প্রতি প্রেম। কী অদ্ভুত। তার পরে, কয়েকটা প্রজন্মের মধ্যেই, গোটাটা এমন ভাবে বদলে গেল? আলো এবং শব্দ এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বটা বেড়ে উঠেছিল বহু প্রজন্ম জুড়ে। একটা খুব ব্যাপক গোষ্ঠী সংঘর্ষ ঘটেছিল দক্ষিণাধিপতিরও প্রায় আট প্রজন্ম আগে। তার মানে আমার থেকে পনেরো প্রজন্মের দূরত্বে, মনে মনে হিসাব করেছিলাম আমি। সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় একটা বিদ্যালয়ে। সেখানে বেশির ভাগ শিক্ষকই ছিল আলো, এবং বেশির ভাগ ছাত্রই ছিল শব্দ। ছাত্র-তালিকায়, হয়ত ভুলবশত, হয়ত নয়, এক শিক্ষক সমস্ত আলো-ছাত্রদের নাম রেখেছিলেন প্রথমে। তাতে প্রতিবাদ জানায় শব্দ-ছাত্ররা। প্রথমে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়, পরে তা ছড়িয়ে যায় গোটা জনপদে। কারা মহত্তর? কারা? এরকম যুক্তিও ব্যবহার হত, পেয়েছি নথীতে, যে, আলোরাই মহত্তর, কারণ, আলোরা তাদের শরীর নির্গত আলোকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চাইলেই পোষাক দিয়ে তাকে ঢেকে রাখা যায়। এর বিপরীতে শব্দদের যুক্তি এই ছিল যে, শরীরজাত এই ইন্দ্রিয় সংবেদন যেহেতু জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, তার সংকেতকে নিয়তই তার নিজের মধ্যে এবং নিজের চারপাশে খুঁজে পায় এক জন শব্দ। এবং আলোর সংবেদন রৈখিক, তাই একমুখী, তাই সহজেই তাকে রুদ্ধ করা যায়, শব্দ তা নয়, তাই শব্দরা হল ঈশ্বরের নিকটতর।

আমার গর্ভাধান প্রত্যাখ্যানটা আসে ওই রকম সময়েই। তখন এই আবিষ্কারগুলো করছি আমি। আর আমার চারদিকে ভূমি লুপ্ত হয়ে চলেছে, কিন্তু বোধহয় তার চেয়েও বেশি গতিতে লুপ্ত হয়ে চলেছে সভ্যতা। শিক্ষা উঠে গেছে, আরোগ্যও প্রায় সমাধিতে পর্যবসিত, পারস্পরিক আবেগ অনুভূতিও খুব দ্রুত ক্রমক্ষীয়মান। পারস্পরিক হানাহানি। হিংস্রতা তো তাই হয়, হিংস্রতাকে নিত্যনতুন শিকার সরবরাহ করে যেতে হয়, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। বাইরের শিকার শেষ হলে, তার গতিমুখ ঘুরে যায় অভ্যন্তরে। এই গোটাটা প্রত্যক্ষ করছিলাম, আর দক্ষিণাধিপতির প্রতি বিরূপতাটা বেড়ে চলেছিল সীমাহীন ভাবে। এখন, এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে করতে, নিজের মধ্যেই একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা প্রবণতা আবিষ্কার করলাম আমি এই ঘটনায়। শুধু তো দক্ষিণাধিপতি নয়, আরো আরো সেনাপতিরাও তো ছিল, আরো সেনা, গোটা আলো গোষ্ঠী মানেই তো সেনা, তাহলে? শুধু ওই এক জন কেন? আসলে কি আমি নিজেকেই গুরুত্বপূর্ণতর করে তুলতে চাইছিলাম, নিজের কাছেই? নিজের সঙ্গে দক্ষিণাধিপতির বংশানুক্রমের প্রবাহটাকেই একটু উচ্চারিত করে তুলতে চাইছিলাম ওই ঘৃণা দিয়ে?

কে জানে? কেউই জানে না। আর কেউ জানবেও না।

দেওয়াল থেকে কিছু একটা এল। কোনও একটা সংবেদন। হয় আলো, শব্দ, নয় কোনও কম্পন। এত মনোযোগে লিপিবদ্ধ করে চলেছি ইতিহাসটা, যে, প্রথমে খেয়ালই হয়নি। কিছু একটা হচ্ছে কোথাও। সমাপ্তি কি শুরু হয়ে গেল? আবার এই সংবেদনটা আমার শরীর থেকেই নয় তো? দেওয়ালের দিকে দেখার জন্যে দৃষ্টি তুলেই খেয়াল হল, শরীরের আলোর স্পন্দনও প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেছে। এত জোরে স্পন্দিত হতে দেখিনি কখনও আগে। এমন বাস্তবতাও তো আগে আসেনি। বাস্তবতা, বা, বাস্তবতার বিলোপ, যাই বলা হোক। এই ইতিহাস লেখার মত গভীর কোনও অভিজ্ঞতা আমার হয়নি এর আগে। লিখতে লিখতে যে প্রতিক্রিয়াগুলো আসছে আমার ভিতর, তাকে জানান দেওয়ার মত ভাষা নেই আমার, আর হবেও না কখনো।

ইতিহাসটার কাছে তাই আমি যথার্থ থাকার চেষ্টা করছি। গোটা এই লিপিতেই, যখনি আলো আর শব্দদের একত্র উল্লেখ এসেছে, আমি উল্লেখ করেছি, 'আলো আর শব্দ' বলে। কখনওই এই পারম্পর্যটা বদলাইনি। বারংবার ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও। কারণ, এইটাই তো আমি। আমার কাছে তো, সদাসর্বদাই, 'আলো আর শব্দ', এর বিপরীতটা তো নয়। এই বাক্যে, এমনকি শব্দবন্ধ আকারেও আমি লিখলাম না বিপরীত শব্দবন্ধটা। আমি এটাই। আলো গোষ্ঠীর সভ্যতা। সেই জন্যেই কি আমি তখন দক্ষিণাধিপতির ব্যক্তিনামটা লিখলাম না? এই সমাপ্তিটা, অবলোপটা, বাস্তবতার অবলোপটা, আমার অবলোপটা আসলে অবলোপ নয়? আসলে একটা প্রত্যাগমন? আমিই সে? আমিই দক্ষিণাধিপতি? সেই মহীয়ানতাটা নিজের মধ্যে নিয়ে আসা?

কিন্তু, তখন, সেই গর্ভাধানের প্রসঙ্গে, আমি তো এর বিপরীতটাই চাইছিলাম। সবার যেমন আসে, এক সময় না এক সময়, গর্ভাধানের প্রসঙ্গ, আমারও এসেছিল। অনাদি অতীতে, অনেক অতীতে, কোনো এক সময় গর্ভাধান ঘটত প্রাকৃতিক ভাবেই। পাঠ্য কৃষিবিজ্ঞানে বা জীববিদ্যায় এর উল্লেখটাও আসত খুব তির্যক ভাবে, কিন্তু, জনশ্রুতি মারফত সবাই জেনে যেত, এক সময় কী ভাবে, একটা মূল নিষেকী প্রাণীর কাছে সবাইকে যেতে হত, সেখান থেকে গর্ভাধান ঘটত। ঠিক কী ঘটত সেই নিষেকী প্রাণীর কাছে গিয়ে, সেটা কেউই জানেনা, মহাফেজখানাতেও কোথাও আলোচিত হতে দেখিনি। আর এটা এত প্রাচীন একটা বিষয়, বহু হাজার লক্ষ কোটি প্রজন্ম আগের, তাই সেটার ন্যূনতম কোনও উল্লেখও হারিয়ে গিয়ে থাকতে পারে বহু বহু প্রাচীন কোনও যুগেই। আমাদের বহু বহু প্রজন্ম আগেই এই নিষেকী প্রাণীর জায়গা নিয়েছে একটা নিষেকী সংস্থা, একটা যন্ত্র। সেই যন্ত্র এবং যন্ত্রের গৃহ নিয়ে নানা শৈশবিক জনশ্রুতি শুনেছি আমাদের শৈশবে। নানা রোমাঞ্চ, নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা বা কল্পনা।

আমারও যখন ডাক এল গর্ভাধানের, দক্ষিণাধিপতির প্রতি সেই তীব্র ঘৃণাটা তখন তাড়িত করে নিয়ে বেড়াচ্ছে আমাকে। মহাফেজখানার প্রতিটি আবিষ্কার আমায় নতুনতর গভীরতর ঘৃণায় ঠেলে দিচ্ছে। নিজের কাছে যে ভাবে যুক্তিটা এসেছিল, সেটা অনেকটা এই রকম যে, এই অভিশপ্ত বংশানুক্রম আমি আর রাখব না। যেন এই ভাবেই আমি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারলাম দক্ষিণাধিপতিকে, অনেক বিলম্বে, তবু তো সেটা মৃত্যুদণ্ডই। আগে শুনেছি, গর্ভাধান প্রত্যাখ্যান করলে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হত কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু, ততদিনে, যে কোনো সরবরাহই, যে কোনও পরিষেবাই এতটাই তলানিতে এসে ঠেকেছে যে, কেউ কিছু প্রত্যাখ্যান করলে সেটাই যেন স্বাগত হত, কারণ জানতে চাওয়ার প্রশ্নটাই আর নেই। অর্থাত, আমি সন্তানহীন রয়ে গেলাম, সমাপ্ত হয়ে গেল দক্ষিণাধিপতির বংশধারা। তারপর তো, এর অল্প সময়ের মধ্যেই, গোটা গর্ভাধান আশ্রমটাই অন্তর্হিত হয়ে গেল। অর্থাত, সিদ্ধান্ত বদলের আর কোনও সম্ভাবনাই রইল না।

এরপর এটা নিয়ে যে নিজের মধ্যে কোনও প্রশ্ন, বা, কখনও কোনও বহতা অনুতাপ আসেনি তা নয়। বিশেষত, এর পর যখন কেউ বিবৃত করেছে গর্ভাধানের অনন্য অভিজ্ঞতার। জনশ্রুতি যা বলে, গর্ভাধান একটা চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা। এর কোনো বিকল্প হয় না। এই গোটাটাই আমার ঠিক গোষ্ঠীপ্রেমের মতই, আর একটা নির্মিত রূপকথা বলে মনে হয়। যার কখনো গর্ভাধান হয়নি, তার যদি চূড়া বা তার অন্ত না-থাকে, তাহলে তার চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা ঘটতেই পারে না। তাই তার চূড়ান্ত থাকবে তার নিজস্ব চূড়াদের ভিতরই। আর, কর্তৃপক্ষ এই রূপকথা পছন্দই করবে, কারণ, গর্ভাধান মানেই আরো যোদ্ধা, আরো জয়।

তবু, কখনো কখনো একটা কৌতূহল জাগে আমার ভিতর। ঠিক কী হয় গর্ভাধানে? যেমন জানি, কারোর সন্তান জন্মায় শরীরের শীর্ষদেশ থেকে, কারোর বা সম্মুখভাগ, মানে, দৃষ্টি যে দিকে থাকে। কারোর কারোর আবার অন্য জায়গা থেকেও হয়। সন্তান জন্মানো মাত্র তাকে দেখে কী অনুভূতি হয়? শুনেছি স্তরের পর স্তর, প্রায় অন্তহীন কম্পন জাগে শরীরে, শরীরের আলোর তীব্রতা প্রায় অন্তহীন হয়ে ওঠে। কেমন সেই কম্পনের তরঙ্গ? বাস্তবতা অবলোপের মত? এই লিখতে লিখতেই মনে এল, যদি এমন হয়, যে বাস্তবতা অবলোপ মানে জীবিত প্রাণীটি আসলে গর্ভাধানে চলে যায়? অন্য বাস্তবতায়, অন্য একটা ব্রহ্মাণ্ডে? আমি কি আসলে এই কল্পনা দিয়ে আমার অনুতাপকেই অতিক্রম করতে চাইছি, আমার গোপন কোনও বাসনা অপরিপূরণের বেদনাকে?

প্রায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে উঠছে আলোর স্পন্দন, আমার শরীর কি স্থির হয়ে আসছে? শীতল? দেওয়ালের রং – আমি লক্ষ্যই করিনি – দেওয়ালের রঙ বদলাচ্ছে দ্রুত, ঢেউয়ের পর ঢেউ, যেন দেওয়ালের ওপারে অন্য এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে কোনও তরঙ্গ জাগছে –